টাঙ্গুয়ার হাওড়: ফ্রেমে বাঁধা জলজ সৌন্দর্য

হাসান নীল

সবুজ মখমল বিছানো স্থল আর জলজ সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশের জলাধারগুলো ছোটবড় যেন ফ্রেমে বাঁধা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ছবি। সৌন্দর্যের বিচার করলে তালিকায় ওপরের দিকে থাকবে সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত টাঙ্গুয়ার হাওড়। গগন হরকরা লিখেছেন, 'তারে যে দেখেছে সে মজেছে...'। হ্যাঁ, এমনই এ হাওড়ের রূপ। নারীর সৌন্দর্যের বর্ণনা যেমন ছকবাঁধা উপমায় বাঁধা যায় না, টাঙ্গুয়ার হাওড়ও তাই। দেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে হাওড়কন্যা সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলা দুটি মিলিয়ে অবস্থিত টাঙ্গুয়ার হাওড়। যতদূর চোখ যায় শুধু জলের সঙ্গে সৌন্দর্যের মিলন চোখে পড়ে। ৫১টি জলমহাল নিয়ে বিস্তৃতি প্রকৃতির এই লীলাভূমি। দেশের অন্যতম এই জলভূমি আয়তনের দিক থেকে ৯ হাজার ৭শ ২৭ হেক্টর অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত। তবে বর্ষাকালে হাওড়ের বুকে যখন জলের স্রোত নামে, তা হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ। আয়তনও বেড়ে দাঁড়ায় তখন ২০ হাজার হেক্টর।

টাঙ্গুয়ার হাওর ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাদদেশে অবস্থিত। মেঘালয় থেকে নেমে আসা ৩০টি ঝরনার স্বচ্ছ জল নেমে এসে মিশেছে এ হাওড়ের জলে। প্রকৃতির অপরূপ লীলাভূমি এই বিশালকায় জলাশয়। হাওড় জুড়ে রয়েছে নানা জাতের পাখি আর গাছ। সুনামগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে শরীর যখন ক্লান্ত, ঠিক তখন হাওড়ের মুখে ঢুকতেই দেখতে পাবেন সারি সারি হিজল গাছ দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হবে, হাওড়ের পর্যটকদের স্বাগত জানাতেই ওদের এই দাঁড়িয়ে থাকা। প্রাকৃতিক এই অভিবাদন পেয়ে নিমেষেই দূর হয়ে যাবে আপনার সমস্ত ক্লান্তি। চোখ জুড়িয়ে দেবে জল ও জলজ সৌন্দর্য। স্বচ্ছ জলের নিচের লতা-গুল্মের স্নিগ্ধতা মনের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেবে কানায় কানায়। টাঙ্গুয়ার হাওড় হরেক রকম উদ্ভিদের স্বর্গরাজ্য। নানা আকৃতির সেসব গাছ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিজল, করচ, বরুণ, পানিফল, হেলেঞ্চা, বনতুলসী, নলখাগড়া, বল্লুয়া, চাল্লিয়া, সিংড়া, শালুক, শাপলা, গুইজ্জা কাঁটা, উকল জাতের উদ্ভিদরাজি।

হাওড়ের জীববৈচিত্র্যের বড় একটি অংশ জুড়ে রয়েছে পাখি। হরেক রকম পাখি দেখা যায় টাঙ্গুয়ার হাওড়ে। পাখির কলকাকলি ও প্রকৃতির সঙ্গে খেলে বেড়ানোর দৃশ্য অসাধারণ। ৫১ প্রজাতির পাখির বাস এখানে। তাদের জলকেলি, ওড়াওড়িতে সর্বদা মুখর থাকে স্থানটি। নভেম্বরে এর সঙ্গে যোগ দেয় পরিযায়ী পাখির দল। প্রকৃতিতে যখন নেমে আসে শীত মৌসুম তখন সাইবেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়া, নেপালসহ বিভিন্ন শীতপ্রধান দেশগুলোতে বসবাসকারী পাখিদের জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। শীতের তীব্রতা থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে তারা ডানা মেলে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল অভিমুখে। হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে পাখিগুলো উড়ে এসে আশ্রয় নেয় বাংলাদেশের বেশ কয়েক জায়গায়। সাময়িক আবাস গড়ে তোলে। এর মধ্যে টাঙ্গুয়ার হাওড় অন্যতম।

প্রতি বছরই বেশ কিছু বিরল প্রজাতির পাখির আগমন ঘটে। প্যালাসেস ঈগল, বড় আকারের গ্রে কিংস্টর্ক রয়েছে এই দলে। এছাড়া অনেক বিপন্ন প্রজাতির পাখিও দেখা যায় টাঙ্গুয়ার হাওড়ে। বিরল প্রজাতির পাখিরও দেখা মেলে। এই দলে আছে বৈকাল তিলিহাঁস, বেয়ারের ভুঁতিহাস এবং কালো লেজ জৌরালি। বিরল প্রজাতির পাখিদের মধ্যে আরও আছে কালোপাখা টেঙ্গি, মোটাঠুঁটি ফাটানো, ইয়ার, মেটে রাজহাঁস, মাছমুরাল, লালবুক গুরগুরি, পাতি লালপা, গেওয়াল বাটান, লম্বা আঙুল চা পাখি, বড় গুটি ঈগল, বড় খোঁপা ডুবুরি, কালো গির্দি প্রভৃতি।

পাখি ছাড়াও টাঙ্গুয়ার হাওরের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করেছে নানা প্রজাতির স্তন্যপায়ী ও উভচর প্রাণী। এখানে ছয় প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর বাস। আরও রয়েছে কয়েক প্রজাতির সাপ। এর মধ্যে জালবোড়া ও কোবরার দুটি প্রজাতি উল্লেখযোগ্য। ২০০ প্রজাতির মাছ রয়েছে তাহিরপুর ও ধর্মশালার বুকজুড়ে বিস্তৃত এই হাওড়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাছ হলো মহাশোল। মহাশোলের দুটি প্রজাতি এখানে পাওয়া যায়। তবে আপনি চাইলে মাছগুলো জল থেকে তুলে নিয়ে ভেজে বা মনের মতো করে রান্না করে খেতে পারবেন না। কেননা এখানে

মাছ ধরা নিষিদ্ধ। ২০০৩ সাল থেকে হাওড়ের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে জেলা প্রশাসন। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এ হাওড়ের ভূমিকা যেন ঠিক মায়ের মতো। এ জলাশয়কে তাই 'মাদার ফিশারিজ' বলে ডাকা হয়। টাঙ্গুয়ার হাওড় দেশীয় মাছের অন্যতম বিচরণকেন্দ্র হিসেবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের জন্যও এ হাওড় নিরাপদ। দীর্ঘদিন পানির নিচেও টিকে থাকতে পারে এমন কিছু বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ এখানে আছে।

প্রতিবেলা রূপ পাল্টায় এ হাওড়। মেলে ধরে তার সৌন্দর্য। ভোরবেলা হাওড় থাকে শান্ত ও নিরব। সকালের আলো ফুটতেই পরিবেশ বদলে যায়। হাজারো পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে চারপাশ। এসময় প্রকৃতিও যেন হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখা যায় এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনের চিত্র। সন্ধ্যার হতেই হাওড় যেন হয়ে ওঠে স্বপ্নের আধার। চাঁদের রূপালি আলোয় জলাধার হয়ে উঠে সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এ সময় স্থানীয়রা মেতে ওঠে বাউল গানের আসরে।

বছরের দুই মৌসুমে টাঙ্গুয়ার হাওড় চোখে বেশি তৃপ্তি দেয়। বর্ষা ও শীতকাল। বর্ষা এলে নতুন পানিতে থৈ থৈ করে, বিস্তীর্ণ জলরাশিতে ছেয়ে যায় গোটা হাওড়। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সারি সারি হিজল ও করচ গাছ। দেখে মনে হয় জলের চাদর ফুটো করে বেরিয়ে এসে অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে গাছগুলো। থৈ থৈ বর্ষায় হাওরের গ্রামগুলোকে মনে হয় ছোট ছোট একেকটা দ্বীপ। এ সময় ঢেউ তোলা জল ও প্রকৃতির সৌন্দর্য মিলেমিশে সব যেন একাকার হয়ে যায়। এ সৌন্দর্য দেখে তৃপ্তি পেতে ঢল নামে পর্যটকের।

শুষ্ক মৌসুমে হাওড়ে দেখা যায় সৌন্দর্যের আরেক রূপ। এ সময় জল কম থাকায় হিজল-করচ সারির মধ্য দিয়ে অনায়াসে হেঁটে বেড়ানো যায়। আর শীত মৌসুমে তো হাওড় মুখরিত থাকে পাখিদের কলকাকলিতে। হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আসা নানা প্রজাতির পরিযায়ী পাখি এখানে এসে বাড়িয়ে তোলে হাওড়ের সৌন্দর্য। তার সঙ্গে যোগ দেয় দেশি পাখি। ফলে নভেম্বর নামতেই টাঙ্গুয়ার হাওড় হয়ে ওঠে পাখিদের স্বর্গরাজ্য।

ঢাকা থেকে টাঙ্গুয়ার হাওড়ে যেতে চাইলে আপনাকে প্রথমে চেপে বসতে হবে হাওড়কন্যা সুনামগঞ্জগামী বাসে। শহরের সায়দাবাদ বাস টার্মিনাল থেকে শ্যামলী পরিবহন, হানিফ এন্টারপ্রাইজ, এনা পরিবহনসহ বেশকিছু বাস আপনাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত। সুনামগঞ্জ পর্যন্ত যেতে আপনাকে ভাড়া গুণতে হবে ৭শ থেকে ৮শ টাকা। আর যদি এসি বাসের কথা ভাবেন তাহলে ১ হাজার টাকার সংস্থান রাখতে হবে।

সুনামগঞ্জ পৌঁছে সাহেব বাড়ির ঘাট পর্যন্ত যেতে হবে রিকশায়। এরপর সেখান থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকা বা স্পিডবোট আপনাকে বয়ে নিয়ে যাবে টাঙ্গুয়ার হাওড়ে। এই জলযাত্রায় আপনি সময় বাঁচাতে চাইলে স্পিডবোটের ওপর নির্ভর করতে পারেন। এর জন্য ভাড়া গুনতে হবে ৭ হাজার ৫শ থেকে ৮ হাজার টাকা। মাত্র দুই ঘণ্টায় পৌঁছে যাবেন হাওড়ে। আর সময় হাতে থাকলে কিংবা খরচ বাঁচাতে চাইলে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় উঠতে পারেন। সময় পাঁচ ঘণ্টা লাগলেও ভাড়া কমে যাবে অনেকটা। ২ হাজার ৫শ থেকে ৩ হাজার টাকার মধ্যেই পৌঁছে যেতে পারবেন হাওড়ে।

হাওড়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় রাত্রিযাপনের কোনো বন্দোবস্ত নেই। তবে অনেক নৌকা ও ট্রলার রয়েছে। সেগুলো রাত্রিযাপনের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে আপনাকে ভাড়া বাবদ দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা। আর যদি রাত্রিযাপনের সময় হাই কমোডসহ বাথরুম, ছাদে তেরপল সুবিধা চান তবে ইঞ্জিনচালিত বোট ভাড়া করতে পারেন। ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা ভাড়া গুনতে হবে। এছাড়া ৩ কিমি উত্তর-পূর্বে টেকেরঘাট চুনাপাথর খনি প্রকল্পের রেস্ট হাউজ রয়েছে। চাইলে সেখানেও অবস্থান করতে পারবেন। এছাড়া সুনামগঞ্জে একাধিক হোটেল রয়েছে পর্যটকদের থাকা খাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করতে।

একসময় শুধু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হাওরে গেলেও মানুষ এখন পরিবার পরিজন নিয়েও এ সৌন্দর্য উপভোগ করতে যায়। হাওরের বুকে ঘুরে বেড়ানোর একমাত্র মাধ্যম হলো জলযান। ভাড়ায়চালিত ছোট বড় অনেক নৌকা ও স্পিডবোট রয়েছে এখানে। পর্যটকরা নিজেদের সুবিধামতো নৌকা কিংবা স্পিডবোট ভাড়া করে উপভোগ করেন হাওড়ের সৌন্দর্য। জোসনা রাতে চাঁদের আলো যখন ছুঁয়ে যায় জলের বুক তখন পর্যটকরা সে আবেদনময় সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন মন ভরে। হারিয়ে যেতে পারেন সুরের মূর্চ্ছনায়। প্রকৃতিও সে সুরের সাথে তাল মেলায়। ঝিরি ঝিরি বাতাস ও রাতের বুক চিরে ডেকে যাওয়া বিবাগী পাখির ডাকে আরও মায়াবী হয়ে ওঠে হাওড়। যে রূপে মজেছিলেন সাধক কবি হাছন রাজা, বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিম।